OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 151 - 165
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প : জীবনাভিজ্ঞতার শৈল্পিক রূপায়ণ

সুব্রত রায়
বঙাইগাঁও ইউনিভার্সিটি, আসাম
Email ID: roysubrata256@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
lituative, genres, contemporary, deserves, wider, comparison, experiences, materials, critical interpretation, ulma-matter.

Abstract
Even though the genres of lituative have intimate relation with contemporary life, Short Story as a form deserves a wider canvas of life in comparison to other genres. That is why, even though Nilanjan Chattopadhyay wrote about contemporary life in many genres based on his experiences, these experience found voice in his Short Stories. He collected many experiences of life at his service period and based on those experiences whatever materials can be found in his many Short Story anthologies, I have chosen only a few stories for critical interpretation in this article. This is the ulma-matter of my research paper.

Discussion

বিশ শতকের শেষ দুইদশক ও একুশ শতকের প্রথম দুইদশক ব্যাপ্ত করে যাঁদের লেখনী বাংলা সাহিত্য ধারাকে উন্নয়নমুখী করে তুলেছে, বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যকে স্রোতস্বিনী পথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি জুগিয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন লেখক হলেন নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ইং ১৯৫৬ খ্রিঃ)। অপরাপর বহু লেখকের মতোই কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনিও সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। এমনকি আজও তিনি দুর্ণিবার গতিতে নিয়মিতভাবে কবিতা লিখে চলেছেন এবং কবিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ - নিবন্ধও অব্যাহত গতিতে প্রবহমাণ হয়ে চলেছে তাঁর অভিজ্ঞতাপুষ্ট লেখনীমুখে। গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে তিনি বিপুল বর্ণবিন্যাসে গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। উল্লেখ্য যে, পেশায় ছিলেন তিনি সরকারি আমলা তথা ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসের (আই.এ.এস.) একজন দক্ষ প্রতিনিধি ও অন্যতম সদস্য। কর্মসূত্রে তাই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় এবং সেই সুবাদে তাঁর জীবনে ঘটেছে ভিন্নমুখী জনপদ ও বিচিত্রধর্মী মানুষের সান্নিধ্য। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদে আসীন থেকে কর্ম তৎপরতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে করে গেছেন নিরন্তর সাহিত্য সাধনা। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা আর বহু পঠনপাঠনের ছাপ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে স্বীয় সাহিত্য কর্মের পাতায় পাতায়। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস যেমন পরিণত মনের খোরাক জোগায় তেমনই তা এনে দেয় রহস্য সন্ধানী, প্রেমপিপাসু ও মনস্তত্ব পিয়াসী হৃদয়েও শান্তি এবং আশ্বাসের প্রলেপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'এইসব দিন রাত্রি' (১৯৮২ খ্রিঃ) এবং তারপর লেখেন 'ছোট জীবন বড় জীবন'। উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ যেকোনো উন্নতমানের শিল্পীর জন্যই গৌরবের বলে মনে হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ট্যাং কোসরাস' (১৯৯৬ খ্রিঃ)। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে লিখে গেছেন প্রায় নব্বইটি উপন্যাস। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- 'হে প্রেম', 'বুকের গভীরে', 'আলো আকাশ অন্ধকার', 'ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো', 'মৃত্যুর দাগ', 'জাগো প্রেম', 'আলো আছে', 'তুমি ডাক দিয়েছ', 'কালো গোলাপের রহস্য', 'পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস', 'শঙ্খচূড়ের ফনা', 'ছায়া মারীচের প্রেম', 'নরকের রং লাল', 'দুজনে দেখা হল', 'হৃদয় ভরে দাও', 'থ্রিলার অমনিবাস' (২ খণ্ড), 'হত্যাকাণ্ডের আড়ালে', 'যারা ভালোবেসেছিল', 'রহস্য ৫৫৫', 'রহস্য হীরের দুল', 'আলোর পাখি', 'প্রেমিক কয়েকজন', 'চিতি সাপের বিষ', 'ভালোবাসা তুমি কোথায়', 'তুমি সুন্দর', 'প্রেম এসেছিল', 'বুকের গভীরে', 'যখন এসেছিলে', 'রিতার সাথে দিনরাত', 'বিষের ছোবল', 'শিয়রে মৃত্যুর ছায়া', 'পানশালায় নর্তকী খুন', 'কুকুরের চোখ জ্বলছে', 'নীল প্রেমিক', 'শেষ মেট্রোয় আততায়ী', 'ভালোবাসার আলো', 'ভালোবাসার ঘর', 'ডবল রহস্য', 'দুটি রহস্য কাহিনী', 'বারো রহস্য তেরো রোমাঞ্চ', 'আমলা কথা', 'তুমি সুন্দর', 'সুন্দর হৃদয়', 'সেজানের ছবিতে এত আপেল কেন' ইত্যাদি গদ্য গ্রন্থ। বাংলা গল্প রচনাতেও তাঁর সমদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের তুলনায় কম হলেও নীলাঞ্জনের গল্পভুবন তাঁকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ হ'ল- 'মিশ্ররাগ' (১৯৯০) এবং দ্বিতীয়টির নাম 'গন্ধ' (১৯৯৭)। তাছাড়া রয়েছে 'গণ প্রহারের খসড়া', 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'আমার একান্নটি গল্প', 'কাপুরুষদের এই শহরে', 'পঞ্চাশটি গল্প', 'রহস্য গল্প সংগ্রহ আগাথা ক্রিস্টি', 'সেরা ৫০টি গল্প', 'সাহিত্যের সেরা গল্প', ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ সমূহ।

বিভিন্ন শ্রেণির সাহিত্য প্রকরণ নিয়ে চিন্তা-চর্চার অবকাশ দেখা গেলেও সাম্প্রতিক বাংলা কথা- সাহিত্যে নীলাঞ্জনের অবদান মূলত অনস্বীকার্য। সমালোচক তপন কুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, -

> "নীলাঞ্জনের কথাসাহিত্যে এসেছে মধ্যবিত্তের জীবনের বিচিত্র অনুভূতি।"[১]

এহেন অনুভূতির বর্ণময় বিন্যাসেই নীলাঞ্জনের কৃতিত্ব - যা তাঁর কথাসাহিত্যকে অমোঘ করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষত এই মধ্যবিত্ত জীবনবলয়কে ছোটগল্পের পরিসরে আনতে গিয়ে সরকারি কর্মচারী, পুলিশকর্মী, সুখী ও ভোগী, মধ্যবিত্ত মানুষ, কামনাতাড়িত পুরুষ, রূপের অহংকারে মত্ত থাকা রমণী প্রভৃতি স্বীয় চোখেদেখা বাস্তব জগতের রক্তমাংসবিশিষ্ট জীবন্ত মানুষের সার্বিক চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলেন তিনি। এককথায়, কর্ম জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্প সমূহ। তাইতো প্রথম দুটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। গল্পগুলির আবেদন বহুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং অধিকাংশ আগ্রহী পাঠকের চিত্তজয় করে কালের কষ্ঠি পাথরে খোদিত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত অথচ নতুন ঘরানার গল্পসমূহ সমকালে প্রচুর সমাদর লাভ করে যেগুলি একদা 'দেশ' পত্রিকার সম্পদ বলেই পরিগণিত হয়েছিল। শুধু 'দেশ' নয়, তিনি ক্রমাগত লিখেগেছেন 'আজকাল', 'শারদীয় আজকাল', 'রবিবারের সকালবেলা', 'আনন্দ বাজার', 'অন্য প্রমা', 'কাটোয়ার কলম', 'বিভাব', 'মল্লার', 'আকাশ দীপ', 'অমৃতলোক', 'বর্তমান বরিবারের পাতা' প্রভৃতি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রস্থলে। এজাতীয় স্তরে তাঁর অবাধ বিচরণই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় নীলাঞ্জনের স্বীকৃতিকে। তাঁর গল্প পাঠকালে আমাদের মনে হয়, তিনিও যেন মতি নন্দীর মতোই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের নিষ্ঠুর সমালোচক।অক্লান্ত কর্মসাধনাই ছিল নীলাঞ্জনের জীবনব্রত। একবৃহত্তর কর্ম যজ্ঞে নিয়োজিত থেকে যেভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেছেন তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তাঁর সাহিত্যসৃজনে চারপাশের বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে তুলে ধরার মাধ্যমে এক চিরন্তন সাহিত্যিক সত্যের প্রতিষ্ঠা দান করতে চেয়েছেন তিনি। সমালোচকপ্রবর শ্রদ্ধেয় ড. দেবেশ কুমার আচার্য মহাশয় নীলাঞ্জনের গল্পের জাত চিনিয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন এভাবে, -

> "নীলাঞ্জনের গল্পে রয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্রণ। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ, মিথের প্রয়োগ ও যাদু বাস্তবতার প্রকাশে তাঁর গল্পের শৈলী পাঠকের কাছেভিন্ন স্বাদ এনে দেয়। বিশেষ করে লেখকের সামাজিক-পারিবারিক প্রশাসনিক জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর গল্পগুলি। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক তাঁর গল্পের বিষয়কে সার্থক শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর সমকালীন সমাজজীবনের জীবন স্বভাবকে ও বৈশিষ্ট্যকে নিপুণভাবে দেখিয়েছেন।"[২]

-এহেন উক্তি যথার্থ বলেই মেনে নিতে হয়।

বলাবাহুল্য, বাংলা গল্প সম্ভারকে আরও প্রগতিশীল পথে উত্তরণ ঘটানোর দায়বদ্ধতা নিয়েও যেন লেখকের এই পথযাত্রা। সাহিত্য জগতে পাদচারণার মাধ্যম বাংলা হলেও তাঁর ভাবনায় সম্পৃক্ত ছিল আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ যার গুণে তাঁর গল্পভুবন হয়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত অভিনব ও আসামান্য আস্বাদনযোগ্য শিল্পকীর্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভালো লেখক হতে হলে জীবনকে অন্তরদিয়ে অনুধাবন করতে হয় এবং দেশ বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গেও একাত্ম সম্পর্ক থাকা চাই লেখকের। এই নিরিখে নীলাঞ্জনকে একজন সুদক্ষ ও সুসার্থক জীবনশিল্পী অনায়াসেই বলা চলে। কারণ তিনি একাধারে জীবনকে দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছে থেকে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়। কথাসাহিত্যিক বিমল কর পর্যন্ত নীলাঞ্জনের গল্পপাঠে প্রভূত আনন্দিত হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

সর্বোপরি, বলা হয়ে থাকে নীলাঞ্জন এমন একজন গল্পকার - যিনি সর্বদা জড়িয়ে থাকেন সময়ের বলয়ে - যে সময়ে তাঁর অবস্থান তারই জালে আবদ্ধ হয়ে তিনি তা থেকে মুক্তির পথ দেখান। এক অপরিসীম বেদনা ও যন্ত্রণা নিয়ে খুলে দিতে চান নগ্নতার মুখোশ, উন্মোচন করতে চান সভ্যতার প্রকৃত সত্যস্বরূপটিকে। বিশেষত মধ্যস্থিত শ্রেণিকে তিনি বারবার তাঁর গল্পে স্থান দিয়ে এক অনির্দেশ্য দর্পণের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাতে যেন তৎপর হয়ে ওঠেন। সাহিত্যরূপী আরশিতে আত্মপ্রতিকৃতি দেখে অনেকেই সচকিত হয়ে ওঠে। এভাবেই তিনি সমাজের নেপথ্যচারী দূষণকে চিহ্নিত করতে বদ্ধপরিকর। সমাজের কদর্যরূপ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজ বিধান ও মনুষ্য চরিত্রের কালিমালিপ্ত দিকের প্রতি তীব্র অঙ্গুঁলি নির্দেশ করে প্রকারান্তরে আশু সম্ভাবনাময় অন্ধকারমুক্ত জীবনধারাকেই যেন ত্বরান্বিত করতে চান তিনি। তিনি দুঃখ, ক্লান্তি, যন্ত্রণা, বিষাদ, ক্লেদ, বিপন্নতা, অবসাদ, বিষণ্ণতা, হাহাকার ও দুর্নীতির কথা বললেও তারই পাশাপাশি ভোলেন না মানুষের প্রেমভালোবাসার কথা বলতে। শান্তির আশ্বাস, বেঁচে থাকার রসদও আমরা পাই তাঁর গল্পসমূহতে। সহজ সরল উপভোগ্য ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করে সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতেও তাঁর অপরিমেয় ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পভুবন মন্থন করতে পারলে আমরা তাঁর মূল্যায়নটিকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হতে পারি। কিন্তু কয়েক পাতার একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে গল্পবিশ্বকে তুলে আনা অসম্ভব ব্যাপার । তাই নির্বাচিত কিছু গল্পের আধারে লেখকের গল্পসত্তা ও গল্পবৈচিত্র্যকে তুলে ধরার প্রয়াস করা যেতে পারে। এই নিরিখে যে গল্পটিকে প্রথমেই বিবেচ্য বলে অনুভূত হয়, সেটি হল তাঁর 'গন্ধ' গল্প। গল্পটি ১৯৯২ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

'গন্ধ' গল্পের মুখ্য চরিত্র জিতেন। গল্পকার চরিত্রটির মধ্যদিয়ে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা মানুষের মানসিক অপচয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও গলিত শাসন ব্যবস্থার পচনশীল কার্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্রভাবে কুঠারাঘাত করেছেন। ক্রমাগত দুর্নীতিকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করলেও জিতেনের মধ্যে কোনোরকম নৈতিক টানাপোড়েন বা সংশয়বোধ উপস্থিত হয় না। উল্লেখ্য যে, একটি পগলা কুকুরের ঘৃণিত অপকর্মের মাধ্যমে গল্পের সূত্রপাত। প্রায়শই ঘটে চলে সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো পাগলা কুকুরটির অত্যাচার। প্রাণীটির মুখ থেকে আসা বমির গন্ধে জিতেনের ফ্ল্যাটের প্রত্যেকেই অস্বস্তি অনুভব করে। সিঁড়ির চাতালে যেখানে কুকুরটি শুয়ে ছিল কিংবা বমি করে রেখেছে সেই স্থানটি মেথর ডেকে পরিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় সকলে। নাকে রুমাল চাপা দিয়েও সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার জো নেই। গল্পমধ্যে দেখা যায়,জিতেন একইসঙ্গে দুই ধরনের জীবন কাটায় - একদিকে সে মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সংসারী ভদ্রলোক, সকলের থেকে সম্মান লাভ করে, অন্যদিকে দুর্নীতি পরায়ণ, কার্যালয়ে ঘুষের কারবার করে সে এবং সর্বোপরি সে আদ্যন্ত নারী লোলুপ একজন মানুষ। তার বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও বাসন্তী নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে - যে মহিলা তার থেকে নানাভাবে টাকা আদায় করে নেয়। গল্পে 'গন্ধ' শব্দটি আসলে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পের অন্তিমে কুকুরটিকে মেরে ফেলার জন্য আবাসিকের সকলে উদ্যত হলে জিতেন নিজেই তাদের সহযাত্রী হয়। হাতে লাঠি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও টর্চ নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কুকুরটিকে অনুসন্ধান করলেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু জিতেন অনুভব করে সিঁড়ির ময়লার সেই দুর্গন্ধ। অথচ –

> "গন্ধটা যে ঠিক কোথা থেকে আসছে, এটা বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জিতেন লাঠি হাতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।"[৩]

তাকে অসহায়ভাবে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেই গল্পকার গল্পের যবনিকা টানলেন। রূপকার্থের অন্তরালে লেখক এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কদর্য কুকুরটি আসলে আপাত ভদ্র জিতেনের অবচেতনেই দুশ্চরিত্র দুর্গন্ধময় সত্তারূপে বাস করছে। তারই পচাঁ গন্ধ নাকে এলেও জিতেন তাই কুকুরটিকে চাক্ষুষ করতে পারেনি। সর্বোপরি, সামাজিক অধঃপতিত মানুষ যতোই সরকারি কর্মচারি বা ফ্ল্যাটের অধিবাসী হোক না কেন, তার দ্বারা যে সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল - এই কথাটিও যেন লেখক আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন। তাইতো সিঁড়ির পাশে কুকুরের বমিতে 'জীবাণু কিলবিল করায়' রুমাল চাপা দিয়েও সিঁড়ি দিয়ে ওঠা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। মেথর ডেকে তা পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এই সিঁড়ি যেন উন্নয়নের সোপান। জিতেনের মতো অসৎ, মদ্যপ, ঘুষখোর মানুষের দ্বারা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে অনতিবিলম্বে সমাজকে সচেতন করার মানসে গল্পকার মেথর ডেকে নোংরা অপসারণের ব্যবস্থার কথা বলেছেন গল্পে। এই বিচারে গল্পটি সুসার্থক। রূপকধর্মী একটি মননশীল প্রতীকী গল্প হিসাবে 'গন্ধ' গল্পটির উপযোগিতা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষিতে অনস্বীকার্য বলা চলে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য গল্পসৃষ্টি হল 'দু-নম্বর আসামি' গল্পটি। এটিও ইং ১৯৯২ সালের 'দেশ' পত্রিকারই ফসল। একান্ত বাস্তবমুখী ও গণতান্ত্রিক সমাজবিরুদ্ধ কতিপয় সরকারি কর্মকর্তার অপশাসনজনিত কদাচারের বীভৎস রূপটি ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পে। পার্টির নামে, রাজনৈতিক দলের স্বার্থে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে একাশ্রেণির লোভী সুবিধাভোগী লোক জনগণকে ঠকিয়ে চলেছে, প্রতাড়না করে চলেছে কিছু নিরীহ অসহায় মানুষকে যার প্রত্যক্ষ খতিয়ান এই গল্প। সমাজপতি, মহাজন, গাঁও প্রধান (নৃপতি), দলের অধিপতি ও আত্মসর্বস্ব ক্ষমতাবান ব্যক্তির নির্দেশে অনেক সময়ই অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করতে বাধ্য হয় একদল নিরপরাধ ব্যক্তি। নতুবা জোর করে বাধ্য করানো হয় অপরাধী হতে। এমনই এক চরিত্র প্রতিনিধি এখানে খেতমজুরের সহজ-সরল ছেলে অভিনেতা সুবল মাইতি। নির্দয় সমাজপতিদের নির্দেশে, অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের কুচক্রের বলি হয়ে, পারিপার্শ্বিক চাপে ও ক্ষমতাশালী স্তাবকবৃন্দের চাটুকারিতায় যে নিরীহ, অসহায় ও নির্দোষ মানুষ জীবনে বেঁচে থাকে; অর্থবানদের অঙ্গুলি হেলনে যারা নির্দ্বিধায় অপরাধে সামীল হয় এবং প্রয়োজনে তাঁদেরই প্রিয়জনকে বাঁচাতে গিয়ে যারা আত্মত্যাগ করে তেমনই এক শ্রেণির প্রতিভূ সুবল। এই গল্পও সুবলদের যন্ত্রণা ও বঞ্চনারই সাক্ষী হয়ে উঠেছে। শুধু মাত্র পার্টির স্বার্থে কোনো অপরাধ না করে বিনা বাক্য ব্যয়ে একের পর এক অপরাধ নীরবে মাথা পেতে গ্রহণ করলেও সুবল কিন্তু নারীধর্ষণের মিথ্যা মামলার দায় গ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু চাপে পড়ে ও সাংসারিক দায়ে এহেন জঘন্য অপরাধের আসামি হতে হয় তাকেই। পুলিশের ব্যর্থতা, নেতাদের অনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ ও কর্তৃপক্ষের অন্যায়সঙ্গত কর্মকাণ্ডের অসহায় শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয় সরল-সহজ নির্দোষ সুবলকেই। গ্রামের লোকজনের মিথ্যা ভানসর্বস্ব ব্যবহার, ভণ্ড-দুর্নীতিবাজ পুলিশ অফিসারের চাকরিতে বহাল থাকার অপকৌশল আর চক্রান্ত ও পার্টির নামে করা ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন এখানে লেখক। নীলাঞ্জন যেন এ জাতীয় চরিত্রগুলিকে ও তাদের অপকৌশলের প্রবণতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন সার্চ লাইটের তলায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে। এরই সূত্রধরে আসে গল্পমধ্যে একের পর এক দুর্নীতি ও অপরাধের চিত্র- অথচ যাঁরা অপরাধে সামীল তাঁরাই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সমাজের গণ্যমান্য তাঁরাই। গল্পে দেখা যায়, চোরাপথে গ্রাম্য অধিপতিকে ধরে প্রাইমারি স্কুলের হেড-টিচারকে প্রভাবিত করে হরিহর বয়স কমিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অফিসে সেক্রেটারির পদে বহাল আছেন। নিখুঁতভাবে ক্যাশবুক লিখে অডিট অফিসারের চোখে ধুলো দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভাড়। এমনকি অডিট অফিসারের জন্য 'কুড়ি কেজি দুধেশ্বর চাল' বা 'তিন কেজি ওজনের একটা রুই মাছ' প্রভৃতি উপঢৌকন বা ঘুষের ব্যবস্থা করে রাখতেও হরিহরকে দেখা যায়।

এরপরই আসে গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়- নিরপরাধী সুবলকে দোষী সাজানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ভকুর বদলে আমরা 'ছচু'কে পুলিশের হাতে তুলে দেব।... ভকুর বদলে ছকুকে এখন আসামি সাজাতে হবে।"[৪]

ডাক পড়ল সুবলের। সে যাত্রা পালার অভিনয়ে বিবেকের পাঠ নেবে। তারই রিহার্সাল ফেলে নৃপতির সাক্ষাতে এসে জানতে পারে নারী ধর্ষণের মামলায় তাকে সুধীনদার অপকর্মের সহায়ক ভকুর পরিবর্তে জেলে যেতে হবে। ইতিমধ্যে সে দু-দুবার জেলে গেলেও এবারে রাজি হয় না, -

> "রেপ কেসের আসামি হতে আমাকে বোলো না। লোকে ছিছি করবে।"[৫]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পার্টির নেতা কূটকৌশলী সুধীনদা তার ভাইকে পিয়নের চাকরি করে দেওয়ার আর বোনের সরকারি হাসপাতালের নার্সের চাকরি পাকা করার প্রলোভন দেখান। তাতেও রাজি না হলে শেষে রীতিমত ভয় দেখিয়ে এবং স্থানীয় পুলিশ মহেন্দ্রকে হাতে রাখতে ও তার বদলি আটকাতে রাজি হতে বাধ্য করলেন সুবলকে। নির্দিষ্ট স্থানে সুবলকে লুকিয়ে থাকতে বলা হল (যেখান থেকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে রিপোর্টারসহ দলবল নিয়ে গিয়ে অফিসার মহেন্দ্র সুবলকে উদ্ধার করবে)। মহেন্দ্র চায়, -

> "রেপ কেসের দুর্ধর্ষ আসামিকে সে যে গ্রেপ্তার করেছে, এই খবরটা বেশ ফলাও করে নিউজপেপারগুলোতে ছাপা হোক।"[৬]

তবে তার সুনামের সঙ্গে সঙ্গে ওসির চাকরিটাও বহাল থাকে। নতুবা সৎ এস, পি, সাহেব তাকে অন্যত্র বদলি করে দিলে তার বেআইনী রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত ঘুঁটি সাজিয়ে সুবলকে হাতে নাতে ধরতে গেল ঠিকই, কিন্তু যে সুবল নেতার নির্দেশে একদিন 'হাসতে হাসতে থানায় গিয়ে বড়বাবুর কাছে হাতকড়া পরার জন্যে হাত বাড়িয়ে' দিয়েছে, 'নিজে কোনো খারাপ কাজ না করলেও পার্টির স্বার্থে আসামি হয়েছে' আজ কিন্তু স্ত্রী পরিবার এবং সামাজিক লজ্জার কথা ভেবে সরাসরি নিজেকে সমর্পণ করতে পারল না।[৭] গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর পরও অনেক খোঁজাখুজির বিনিময়ে দেখা গেল সুবলের শরীরটা ঝুলছে। "ব্যাপারটা যে এরকম উলটো হয়ে যাবে, এটা স্বপ্নেও ভাবেনি মহেন্দ্র।"[৮] হতভাগা শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির শিকার হয়ে নিজেকেই শেষ করে দিল। এমন এক দুর্ভাগ্যজনক পরিমণ্ডলে পাঠক সমাজকে নিয়ে গিয়ে লেখক নীলাঞ্জন কেবল সেই যন্ত্রণা ও আবেগমথিত অসহায়ত্বকেই তুলে ধরতে পেরেছেন- যার সমাধানের অন্যকোনো পথ দেখাতে পারেননি। তা একজন লেখকের পক্ষে সীমাবদ্ধতা বলেও মনে হয়েছে তাঁর।তবে একটির পর একটি ইট গেঁথে গল্পকার যেভাবে গল্পমধ্যে অপরাধের পসরা সাজিয়েছেন এবং গল্পটিকে গড়ে তুলেছেন নিটোল বর্ণবিন্যাসে, তাতে গল্পের পরিণতিতে শুধু করুণরস সঞ্চার করতেই সক্ষম হননি; বরং একজন সার্থক বাস্তববাদী লেখক হয়ে উঠতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়, -

> 'সমাজের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবক্ষয়টিকে সুচারু গঠনকৌশলের মাধ্যমে গল্পটিতে লেখক চিত্রিত করেছেন।'[৯]

- এই মন্তব্য যথার্থই প্রণিধানযোগ্য।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প হল - 'সাহেবের দুঃখ'। এখানে দেখানো হয়েছে এক সরকারি আমলার অহংকার ও তা থেকে উত্তরণের সুচিত্র। উচ্চ পদস্থ বয়স্ক সরকারি চাকুরিজীবী টি, কে, রক্ষিত ওরফে ত্রিলোচন কুমার রক্ষিত তাঁর স্বভাব দোষেই জীবনের প্রায় শেষ ধাপে এসে একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তিনি ছিলেন অহমিকার্সবস্ব ও স্বেচ্ছাচারী মানুষ। স্ত্রী রেণু ও পুত্র হিরণের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অপরাপর সংসারী মানুষের মতো নয়। কঠোর অনুশাসনের আবর্তে সংসারটিকে বেঁধে রাখতে চান তিনি। ফলে কড়া নিয়মের নিগড়ে থেকে স্ত্রী-পুত্রেরও বিরক্তি এসে যায়। সাহেবিয়ানাতে এতোই মশগুল যে টি, কে, রক্ষিত কখনও কোনো ব্যক্তিকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দেন না বা তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশে নিঃশ্বাস নেওয়ার অবসরটুকুও দেননি তিনি। বাড়ি ও কার্যালয়ে সর্বত্র ও সর্বদা রূঢ় ও পিতৃতান্ত্রিক আচরণ করে তিনি তৃপ্তি পান। ফলে প্রিয়জন ও পরম আত্মীয়ের কাছেও তাঁকে বিরাগভাজন হতে হয়। এমনকি স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গেও একটা দূরত্ব তৈরি হয়। তবে গল্পটি একটি নাটকীয় বাঁক নেয়, যখন তাঁর স্বীয় পুত্র হিরণই পিতার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পিতার পছন্দের বিষয় কম্পিউটার সায়েন্সের পরিবর্তে ছেলেটি তার নিজের পছন্দের বিষয় ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে চায় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে, -

> "লিটরেচার?- টি. কে. যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।... ও সব সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কারা পড়ে জান? বিজ্ঞান বোঝার মতো মগজ যাদের নেই তারা। তুমি অ্যাত্তো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে ওসব ছাইভস্ম নিয়ে পড়বে? পাগল হয়েছ না কি?"[১০]

- এর জন্য ছেলেকে ঘুষি মারও খেতে হল পিতার কাছে থেকে। কিন্তু ছেলেটি অবশেষে বেছে নিল নিজের পছন্দ করা বিষয়কেই। পরবর্তীতে অধ্যাপনার পেশাতে নিয়োজিত হয়ে পিতাকে দেখিয়ে দিল তার নির্বাচন ভুল হয়নি। পুত্রের বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে যখন সে তার গর্বিত রূঢ় অফিসার পিতাকে স্পষ্টরূপে জানায় যে, তার পছন্দের সহপাঠী তন্ময়ীকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হিরণ বিয়ে করার ব্যাপারে আগে থেকে পিতার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বরং সরাসরি বিয়ে করে মা রেণুকে নিয়ে কলেজের নতুন কোয়ার্টারে থাকার জন্য বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। ছেলের এহেন কার্যকলাপে মায়ের সায় আছে বলেই মনে করেছেন টি.কে. বাবু। তাই বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র বা পুত্রবধূ কাউকেই আটকাননি। বরং সদর্পে বলেছেন 'তোমরা সবাই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। যেখানে পার যাও তোমরা। আমি তোমাদের মুখ দেখতে চাই না। লিভ মি. অ্যালোন।'[১১] স্বামীর অধিকার বা পিতৃত্বের দাবি থেকে তিনি তাদের আটকালেন না ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল এই আত্মঅহংকারী, গর্বিত ও জেদসর্বস্ব অফিসারটি লং ড্রাইভে গিয়ে নিজের জীবনের স্মৃতিচারণা ও কৃতকর্মের রোমন্থন করতে করতে একদা অনুধাবন করতে পারেন যে, এই পৃথিবীতে ও মনুষ্য জীবনে প্রেম ভালোবাসা আর সম্পর্কের একটি অসামান্য ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর মধ্যে অনুতাপের সৃষ্টি করে লেখক নীলাঞ্জন মানব জীবনে প্রেমের অপরিহার্যতার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। প্রৌঢ় টি. কে. রক্ষিত স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বিছিন্ন হয়ে হতাশ অবস্থায় একদিন বেরিয়ে পড়লেন জেলা পরিদর্শনের জন্য। এক গ্রামে গিয়ে জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনিও তারই মতো একাকী নিঃসঙ্গ। বৃদ্ধকে দেখে সাহেবের অন্তঃকরণ জেগে ওঠে। কোনোদিন মানুষকে মানুষ বলে গণ্য না করা, মানুষের আত্মসম্মানবোধকে গুরুত্ব না দেওয়া, নিজের অহৈতুকী জেদ আর অহংকারকে বজায় রাখতে প্রয়াসী টি. কে. রক্ষিত সাতান্ন বছর দু'মাস চারদিন বয়সে এসে জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, -

> "কোনও কিছুই কি আমি ভালোবাসতে পেরেছি কোনও দিন?... নিজের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারী- সবাইকে শুধু দেখাতে চেয়েছি- আমার কত ক্ষমতা? - ভুল ভুল, সারা জীবনটাই ভুল।- ঠিক মতো বেঁচে থাকতে হলে ভালোবাসতে পারার এবং ভালোবাসা পাবার এই দুটোরই প্রয়োজন আছে।"[১২]

- উপলব্ধির এই বিস্তার ও উত্তরণ স্বভাবতই পাঠক মনে সাড়া জাগায়। তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে পাঠকহৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। ভালোবাসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নিয়ে জীবনদর্শনের এজাতীয় উপলব্ধি গল্পটিকে স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছে। লেখক নীলাঞ্জন এখানে একাকীত্ব নিয়ে বাস করা মানুষের শরিক হয়ে তাদের আন্তরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার বার্তা দিতে চেয়েছেন। যাঁরা মিথ্যার আস্ফালনে মেতে থাকেন কিংবা দম্ভ ও গর্বের আশ্রয় নিয়ে জীবনকে ভোগ করতে গিয়ে বরং দুর্বিষহ করে তোলেন পথ চলাকে, নীলাঞ্জন তাঁদের সমব্যথী হয়েছেন এবং দোসর রূপে থেকে তাঁদের ভাবনাকে রূপায়িত করার চেষ্টায় নিয়েজিত থেকেছেন এই গল্পে। লেখক শেষপর্যন্ত জীবনের জয়গানই ঘোষণা করতে চেয়েছেন। তাই গল্পকার সেই অফিসারের জীবনের ক্লান্তি ও অবসন্নতার শোকগাথা বুনেই গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করেন - যে অফিসার-এর মন মর্জি ও জেদের প্রকাশ ঘটিয়েই গল্পটি শুরু হয়েছিল। জীবনের কালো সাদা উভয়দিকের প্রতিফলন ঘটিয়ে সৌন্দর্যময় জীবন-যাপনের প্রতি আস্থা রেখেই যেন গল্পকার গল্পের পরিণতি এঁকেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সাহেবের এক চরম হতাশা ও অনুশোচনার মাধ্যমে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার নেপথ্যে বিচরণশীল মহৎ উদ্দেশ্যটি বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এখানেই গল্পটির চূড়ান্ত সার্থকতা ও এহেন গল্প বয়নে লেখকের সিদ্ধি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নীলাঞ্জনের গল্প রচনার একটি অনবদ্য শিল্পপ্রয়াস 'ভার' গল্প যেটি ১৯৯৪ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। এখানে লেখক শুভেন্দু নামের এক চরিত্রকে মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্য সামর্থ্যবান অথচ সুখস্বপ্নের জগতে বিচরণশীল ভুবন থেকে তুলে এনে গল্পে স্থান দেন। অত্যন্ত বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা স্বরূপ একটি ফ্ল্যাট কেনাকে কেন্দ্রকরে অফিসের সাধারণ কর্মী হিসাবে শুভেন্দুর কার্যকলাপ ও কথাবার্তার বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে গল্পের শুভারম্ভ। একজন দুর্নীতি পরায়ণ, অসৎ ব্যক্তি হিসাবেই গল্পের শুরুতে শুভেন্দুর আত্মপ্রকাশ আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক শ্রেণির নব্যযুবকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যাদের সামর্থ্য না থাকলেও উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সীমা নেই। তাই লোভের বশবর্তী হয়ে তারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। গল্পে শুভেন্দুকে দেখা যায়, অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট বুক করার জন্য অগ্রীম দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে সে অফিস থেকে অসৎ উপায়ে চার ইঞ্চির পাইপ ছয় ইঞ্চি হিসাবে বিক্রি করে, অবাঙালি সুধীর কাপুরকে। বৃহত্তর টেণ্ডারের স্বার্থে মালিক পক্ষকে না জানিয়ে মাল নয়ছয় করার রীতি সমাজে প্রচলিত বলে ধরে নিয়েই শুভেন্দু কু-কর্মে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এতে তার স্ত্রী জয়িতা তাকে অভিনন্দন জানায় এই বলে, স্বামী তার কষ্টোপার্জিত টাকা দিয়ে যে সারাজীবন থাকার মতো একটি আবাসনের সামান্য কয়েকটি কোঠা ক্রয় করার সাহস করেছে তাতেই সে তৃপ্ত ও আনন্দিত। তার স্বামী যে আকর্মণ্য নয়, ঠিকই টাকা জোগাড় করতে পারে এই বিশ্বাস ও আস্থা জয়িতাকে আহ্লাদিত করে তোলে, -

> "সারা জীবন যে বাড়িতে আরামে থাকব, তা আমাদের টাকাতেই কেনা। তোমার রক্তজল করা পয়সায়। এটা ভাবলেই কীরকম আনন্দ হয়।"[১৩]

স্ত্রী-এর এই বিশ্বাস ও নিঃসন্দিগ্ধ মনোভাবই শুভেন্দুকে প্রথম নাড়া দেয়। সে নিজের ভেতরে ভেতরে এক অসহনীয় অস্থিরতা অনুভব করে। আন্তরিক অপরাধবোধের অসহ্য মর্মযন্ত্রণায় সে মনের মধ্যে একটি অনমনীয় ভার অনুভব করতে শুরু করে। এরই মধ্যে খবর আসে শুভেন্দুর একমাত্র বোন রিনির স্বামী জয়ন্ত খুন হয়েছে। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে খুনের কারণ জানতে পেরে শুভেন্দু হতবাক হয় এবং তার মধ্যে রোপিত হওয়া বেদনার ভার অবিরাম গতিতেই প্রবাহিত হতে থাকে। সৎ পরিশ্রমী ও অন্যায়বিরোধী কাজে সতত উৎসাহী জয়ন্ত মাফিয়া লিডারের অনৈতিক মানি বিল পাস করিয়ে না দেওয়ায় তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে মেরে ফেলা হয়। এতে শুভেন্দুর মনে হয়েছে, সততা ও আদর্শকে ধরে রাখতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে এভাবে বিপদের মুখে না ফেললেও পারতো জয়ন্ত। একবার অন্তত রিনির জীবনের কথা ভাবা উচিত ছিল তার। তার কেবলই মনে হয়, "জয়ন্ত ভুল করেছে। আদর্শ নিয়ে সবসময় চলা কি সম্ভব। আদর্শের কথা বইয়ের পাতায় পড়তে ভালো লাগে। রাজনৈতিক নেতা সমাজ সংস্কারকের বক্তৃতাতেও শুনতে খারাপ লাগে না। কিন্তু এই পেশাদারি মনোভাবের যুগে, সাফল্যের পেছনে ইঁদুর দৌড়ের যুগে আদর্শ নিয়ে চলা কি সত্যিই সম্ভব?"[১৪] সাম্প্রতিক সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে এক মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে শুভেন্দু। এই প্রশ্ন যেকোনো মধ্যবিত্তেরই মনে আসা স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল বা হয়তো তার কোনো সুষম সমাধান খুঁজে পায়নি বলেই শুভেন্দুকেও আশ্রয় নিতে হয়েছে চোরা পথ, বেছে নিতে হয়েছে অর্থ উপার্জনের অসৎ উপায়। আর তা পারেনি বলেই সৎ বোনজামাইকে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। জয়ন্তের মৃত্যুর পর তার অফিসের সহকর্মী বন্ধু স্থানীয় অনেকেই শুভেন্দুকে বলেছে, -

> "যেদিন থেকে ও এই অফিসে ঢুকেছিল, সেদিন থেকেই ওর শান্ত নম্র ব্যবহার' তাদের মুগ্ধ করেছিল, তার সততার কথা তারা প্রেসে জানাবে, প্রেস কনফারেন্স ডাকবে ইউনিয়ন, সমস্ত ন্যাশনাল ডেলিতে ছাপা হবে সব খবর, দেশের মানুষ জানবে কী অরাজকতা চলছে পৃথিবীতে, তারা এভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা ভাবছে।"[১৫]

তবুও এই খুনের মীমাংসা হবে কি না কেউ জানে না। তবে জয়ন্তের বন্ধু প্রাণতোষের জবানী থেকে একটা কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, -

> "অপরাধ করলে আইনকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে মানুষের মাথা হেঁট হয়ে যাবেই যাবে।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাণতোষের এহেন মন্তব্য শুভেন্দুর বিবেকে গিয়ে তীব্র চপেটাঘাত স্বরূপ বাজে। তার মনে হয়, সেও তো সাফল্যের কথা ভাবতে গিয়ে সহজ অন্যায় রাস্তাটিকেই গ্রহণ করেছে। এই অন্যায় মিথ্যাটিকে যে তাকেও সারাজীবন মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বার বার তার মনে হল –

> "তার ছবির মতন সাজানো ফ্ল্যাট দেখে কিছুদিন পর, আত্মীয় স্বজ্জন এবং পরিচিতজনরা যখন তারিফ করবে, ঈর্ষার চোখেও তাকাবে কেউ কেউ, তখন কি একটা কথা মনে কাঁটার মতন বিধবে না শুভেন্দুর? যে, সবাই যা ভাবছে তা নয়। জয়িতা যা ভেবেছে তাও নয়। নিজের রক্তজল করা পয়সায় এই ফ্ল্যাট কেনেনি শুভেন্দু। নাহ্, কোনও দিন কাউকে কথাটা বলতে পারবে না শুভেন্দু। আমৃত্যু তাকে মিথ্যের বিশাল এই ভার একা বয়ে বেড়াতে হবে। সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা অনুভব করেই যেন অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠল সে।"[১৭]

এই অন্ধকার আসলে তার চারিত্রিক অধঃপতনের পরিচয়বাহী। তবু এজাতীয় বিবেক দংশন ও প্রতিপদে দোষী মনের অপরাধ প্রবণতাজনিত ভার বহন করে পথচলার মধ্যেই ঘটানো হয়েছে শুভেন্দুর কৃতকর্মের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।দুষ্কর্মের জন্য পরিতাপ ও অনুতাপের চেয়ে বড় শাস্তি আর হতে পারে না। শুভেন্দুকে এহেন শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক গল্পমধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষের হীনমন্যতার মূলে তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন এবং এজাতীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকার একটি অদৃশ্য পথ নির্দেশ করেছেন বলতে হয়। সর্বোপরি, জয়ন্ত ও শুভেন্দুর চরিত্রকে পাশাপাশি স্থাপন করে –

> "লেখক বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ ও আদর্শচ্যুতির বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করেছেন"[১৮]

একজন ব্যক্তি লোভকে সংবরণ করতে না পেরে চোরাপথে রোজগার করে, অন্যজন লোভীসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে আদর্শরক্ষার তাগিদে প্রাণ হারাতেও দ্বিধা বোধ করে না। এহেন বিপরীতধর্মিতা গল্পকারের গল্প বয়ন কৌশলেরই ইঙ্গিতবাহী। উল্লেখ্য যে, এই গল্পে রয়েছে যুগপৎ 'Telling' এবং 'Showing' এর সমন্বয়। এমেরিকান লেখক Wayne C. Booth তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'Rhetoric of Fiction' এ এজাতীয় প্রকরণ শৈলীর অবতারণা করেছেন - যার ছায়া আলোচ্য গল্পেও প্রতিফলিত হতে দেখি। তবে দুর্নীতির টাকায় ফ্ল্যাট কিনে তা যে কোনোদিন স্ত্রীকেও বলতে পারবে না - এধরনের উপলব্ধির প্রকাশ ঘটানোতে সমাজ সচেতন লেখক হিসাবে নীলাঞ্জন এক স্বকীয় মূল্যায়ন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে থাকবেন বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়। এখানেই নিহিত রয়েছে গল্পটির রসাবেদন ও চিহ্নিত হয়েছে তার স্বতন্ত্র মাত্রাটি।

'দূরের আকাশ' গল্পটি নীলাঞ্জনের একটি অনবদ্য শিল্প প্রয়াস। এটি ১৯৯৬ সালের 'চতুরঙ্গ'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পে সুনীতা ও সৌরভের পূর্ব প্রেমের স্মৃতিচারণা, সৌরভের আকস্মিক মৃত্যু, মনোজের সঙ্গে সুনীতার বিয়ে এবং বিয়ের পর মনোজের সঙ্গে চাঁদিপুর বেড়াতে গিয়ে পাথরে খোদাই করা সৌরভের হস্ত চিহ্নের স্পর্শ লাভ, আর তারই সূত্রধরে সৌরভের গুলিবিদ্ধ রূপ সুনীতার মনে ভেসে ওঠা অথচ তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে না এনে গোপন রাখার একান্ত প্রয়াস স্থান পেয়েছে। গল্পটি একবাক্যে করুণরসের আস্বাদবাহী। তবে করুণ আখ্যানটিও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, শুধুমাত্র অব্যক্ত হতাশার মাধ্যমেই গল্পের যবনিকা পতন ঘটেছে। গল্পের মুখ্য চরিত্র সুনীতার প্রেমিক হারানোর পর মনোজের সঙ্গে বিয়ে হয়। এমন একটি পরিবারে মনোজ বেড়ে উঠেছে যার জন্য স্বামীর সবরকম যত্ন নিলেও মনোজ কিন্তু সুনীতার আবেগ অনুভূতির খবর রাখে না। একদিন হঠাৎ মনোজ সুনীতাকে চাঁদিপুরে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বাসনা পোষণ করে। নামটা শোনা মাত্রই 'চাঁদিপুর?' সুনীতা যেন একটা চমক খায়। নামটা শোনার পর থেকেই তার স্মৃতি যেন একটা ধাক্কা খেল। অনেক দিন আগে সন্তর্পণে, গোপনে গুটিয়ে রাখা সুতো যেন আবার খুলতে শুরু' করে।"[১৯] অবশেষে সুনীতা তার স্বামী মনোজের সঙ্গে চাঁদিপুর সমুদ্র সৈকতে উপনীত হলে দশ বছরের পুরোনো স্মৃতি যেন একটা কৌটোর ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসতে লাগল। ঠিক একই স্থানে বছর দশেক আগে সুনীতা তার পরিবার ও পুরোনো প্রেমিক সৌরভের সঙ্গে মাত্র দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল- যার কথা হুহুকরে মনে আসতে লাগল, সুনীতার চোখের সামনে ছায়াপুঞ্জের মতো সমস্ত ঘটনা দৃশ্যমান হয়ে উঠল।কিন্তু সেসব কথা সে মনোজকে বলতে পারল না। বলতে চাইলও না। এখানে এসেই সৌরভ তার কাছে স্বীকার করেছিল যে সে একজন বিপ্লবী ও নৃশংস খুনী। সেই সঙ্গে সৌরভ জানায় তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনুশোচনার কথা এবং ব্যর্থ স্বপ্নের বিপ্লবী সমাজের কথা। সৌরভ বুঝতে পেরেছিল, রক্তপাতের মধ্যদিয়ে স্বপ্নের দেশ গড়া সম্ভব না। বলাবাহুল্য, এখানে এসেই সৌরভ সুনীতার সান্নিধ্যে জীবনকে নতুন করে বুঝতে চায়। কিন্তু পুলিশের গুলিতেই একদিন সৌরভকে মরতে হয়, 'সৌরভ মারা গেছে। শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে।'[২০] - সেই থেকে তাদের এই ক্ষণস্থায়ী প্রেমকে সুনীতার একা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। দশবছর পর ঘটনাচক্রে সুনীতা আবার সেই জায়গাতেই, পঞ্চলিঙ্গ মন্দিরের পাহাড়ে ফিরে এসেছে স্বামী মনোজের হাত ধরে। স্বামীর ব্যস্ততার মধ্যেও তার চোখে ধরা পড়ে এই পাহাড়েই একটা পাথরের গায়ে খোদাই করা বিগত দিনের লিখিত সৌরভের হস্তাক্ষর ও তাতে থাকা তাদের যুগ্ম নামের চিহ্নটা আজও তাদের প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই পাথরটিকে খুঁজে পেয়ে সুনীতার অবরুদ্ধ আবেগ আর চোখের জল বাঁধ মানেনি। কিন্তু সে কিছুতেই স্বামী সকাশে তা প্রকাশ করতে পারবে না। তবু সুনীতার চোখের জল মনোজের দৃষ্টিগোচর হলে সে তা এড়িয়ে 'আসলে দমকা হাওয়ায় চোখে বোধ হয় ধুলোবালি ঢুকে গেছে' বলে কোনো রকমে পাহাড় থেকে নেমে আসে।[২১] মনোজকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে আপন অর্ন্তবেদনা ও মর্মজ্বালাকে একাই নীরবে নিভৃতে বহন করে নিয়ে সংসার অভিমুখে যাত্রা করে সুনীতা। পাঠকমনে গভীরভাবে নাড়া দেয় এই গল্প যেখানে স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্বেও মনোজ ও সুনীতার দুইরকমের বিপরীতধর্মী ভিন্ন মানসিকতা, সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গল্পের ভাষাও কাহিনির সঙ্গে সাযুজ্য পূর্ণ। আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কথাই বোঝাতে চান লেখক।

> "শুধু নিস্তরঙ্গ জলের অবাধ বিস্তার। যেন কোনও উচ্ছ্বাস নেই। আনন্দ নেই। উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো সমুদ্র শুয়ে আছে।"[২২]

এজাতীয় অনুভব নিয়ে সুনীতা ভাবলেও মনোজের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু এধরনের বাক্য ব্যয়ের মাধ্যমে পাঠকসমাজ এমন একটি জীবনদর্শনে এসে উপনীত হয় যেখানে সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগ নৈপুণ্যে 'দূরের আকাশ' গল্পটিকে যে স্বতন্ত্র মাত্রা দানের অভিনব প্রয়াস রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নীলাঞ্জনের 'দূষণ' গল্পটি ১৯৯৭ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পরবর্তীতে গল্প সংকলন গ্রন্থে স্থান পায়। গল্পের কেন্দ্রীয় ও মুখ্যচরিত্র কুমারেশ এমন একটি সময় ও সমাজে অবস্থান করে গল্পটিকে আলোড়িত করে তুলেছে যেখানে সে কর্মক্ষেত্র এবং সংসার জীবন উভয়দিক থেকেই হয়েছে দূষণের শিকার। কুমারেশ সরকারি দপ্তরের একজন কেরানি। সে যখন উন্নয়ন দপ্তরে কাজ করত তখন প্রভাস বেরা নামক এক ইউনিয়নের নেতা এসে কুমারেশকে তার বান্ধবী মৌসুমী হালদারের মাত্র দশ বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত ব্লক অফিসের থেকে সদর ব্লক অফিসে বদলি করার সুপারিশ করতে আসে এবং এক প্রকার কড়া নির্দেশের সুরই শ্রুতিগোচর হয় প্রভাসবাবুর বক্তব্যে। কিন্তু এহেন অন্যায় আবদারে সায় দেয়নি কুমারেশ। তাছাড়া একদিন কুমারেশ এই প্রভাস ও তার বান্ধবীকে সিনেমা হলে কুৎসিত কার্যে লিপ্ত থাকতে দেখে ফেলে। কুমারেশ সমাজ নেতার কাছ থেকে এরূপ কদর্য আচরণ আশা করে না। তাই তাদের অবৈধ মেলামেশা ও সুযোগ করে দেওয়ার নামে মহিলাকে ব্যবহার করার প্রবণতাকে মেনে নিতে পারে না। প্রভাসের শাসানি সত্বেও সে নেতার বান্ধবীর ট্রান্সফারের অফিস ফাইলে সই করতে অস্বীকার করে। এর ফলস্বরূপ সৎ সরল অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করতে নারাজ কুমারেশকেই বদলি করা হল। দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনতন্ত্রের চাপে তাকেই উন্নয়ন দপ্তর থেকে একেবারে রেকর্ড দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, যেখানে কাজ প্রায় কিছুই ছিল না। বলাবাহুল্য, যাদের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতি ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকে, সচরাচর তাদেরই বদলি করা হয় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু তার তো কোনো দোষ নেই, তবে কেন তাকে সেখানে যেতে হবে। এই প্রশ্ন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞেস করেও কোনো সুরাহা হয়নি। বরং সেখান থেকেও আসে সাসপেনসনের হুমকি। তাই নীরবে নতুন অফিসে জয়েন করা ছাড়া কুমারেশের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সেখানে কুমারেশের কাজের কোনো চাপ নেই। তবে খুব নোংরা একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে তাকে কারও কোনো সাহায্য ছাড়াই একঘেয়েমি জীবন কাটাতে ও কার্যনির্বাহ করতে হয়। এখানে আসা থেকে কুমারেশ অফিস ঘরের বন্ধ জানালার মতো নিজের চেতনার দ্বারও অবরুদ্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়। ওপর তলার অমানসিক চাপে ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষোভের মাসুল গুণতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নতুন রেকর্ড দপ্তরে কুমারেশ বড্ড একা হয়ে পড়তে লাগল। একটা অভিশপ্ত গুহার মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হল। মানসিক চাপ কুমারেশের শরীরেও প্রভাব বিস্তার করল। শারীরিক দুর্বলতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাকে গ্রাস করল।[২০] সে ক্রমশ নিজের মধ্যেই সংকুচিত হয়ে পড়ল। ইউনিয়ন নেতার কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে সে যে কেবল পরিবেশ ও কর্মহীনতার আক্ষেপে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত তা নয়, এর প্রভাব এসে পড়ে তার দাম্পত্য জীবনেও। তার শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নেয় স্ত্রী রেখা এবং বহু পুরোনো বন্ধু সৌভিকের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে মেতে ওঠে। একদিন কুমারেশ অফিসের বসের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ, নেতা প্রভাস এই অফিসে গিয়েও উমেদারি শুরু করে দিয়েছিল স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তার ধান্দাবাজের কথা অফিসারকে জানালেও অফিসার কিন্তু প্রভাসের পক্ষাবলম্বন করলেন এবং বললেন,-

"কুমারেশবাবু আপনি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। ... আমি আপনাকে সাসপেন্স করব।'[২৪]

সেও তার চাকরি করার অনীহা প্রকাশ করে, ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকার বাসনায় অফিস থেকে বেরিয়ে আসে এবং গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। বাড়িতে এসে একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে চায় সে। অথচ তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কোনো খবরই তার জানা ছিল না। বিষণ্ন, অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত অথচ সৎ কুমারেশ অসময়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রী রেখা সৌভিক তথা পর পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত রয়েছে। স্ত্রীকে কামাসক্ত অবস্থায় দেখে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্ষোভে দুঃখে রাগে হতাশায় ফেটে পড়ে কুমারেশ এবং স্ত্রীকে সেইমুহূর্তে গলাটিপে মেরে ফেলে। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় উন্মত্তের মতো চলতে চলতে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নেবার আশা পোষণ করে। পুলিশ অফিসারটি বিস্মিত হন। কিন্তু কুমারেশকে সত্যিই তার টেবিলে ঢলে পড়তে দেখা যায়- এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়, -

"এই গল্প নীলাঞ্জনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাজাত ফসল।"[২৫]

গল্পের কাহিনি বিন্যাস, আবেদন ও বর্ণনারীতি প্রশংসনীয়। লেখক কুমারেশ নামক চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৎ, কর্মদক্ষ, অথচ সরকারি উচ্চপদস্থের পেশনে ক্লিষ্ট মানুষের পতনটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন 'দূষণ' গল্পে। এমনকি সমসূত্রে গাঁথা হয়েছে পারিবারিক অসহিষ্ণুতার দিকটিও। স্ত্রী হয়েও স্বামীকে উপলব্ধি করতে না পারার মতো পরিস্থিতি এবং নিজের জৈব চাহিদা মেটানোর জন্য পর পুরুষের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন কুমারেশের মতো চরিত্রকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এক লহমায়। ঘরে বাইরের এই দূষণে কুমারেশ শেষপর্যন্ত খুনী হয়ে উঠেছে এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তার গন্তব্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলখানা। তাঁর এই যে পরিণতি এর জন্য কুমারেশের মতো চরিত্র প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু তাকে সেই পথে টেনে নিয়ে যায় প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ভণ্ড নেতাদের অনৈতিক কার্যকলাপ। একথাই বলতে চেয়েছেন লেখক এখানে চমৎকারভাবে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'টান' গল্পটি ১৯৯৮ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি লেখকের অন্তরের এমন এক গোপন স্তর থেকে উত্থিত যেখানে মরমিয়া অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়। এই গল্পে লেখক বাস্তব ও কল্পনার সুষম সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। তিনি মানব অধিকার কমিশনের অফিসার প্রসূন দত্ত ও রতিকান্ত বসুর প্রেক্ষিত থেকে একটি খুনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। নীলাঞ্জন এখানে অপরাধের ধরন নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু দেখিয়েছেন কীভাবে একজন অপরাধী পিতাকে চিনতে অসুবিধা হয় একটি শিশুর, কষ্ট হয় সবটা মেনে নিতে। অথচ গল্পের শেষে এক অপরিমেয় নাড়ীর টানে সেই সন্তানই পিতার সান্নিধ্য কামনা করে এবং অশ্রুবিসর্জনের মাধ্যমে পাঠকের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। গল্পটি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। আপাত দৃষ্টিতে গল্পে বর্ণিত ঘটনাগুলো অসম্পৃক্ত মনে হলেও আসলে সমস্ত ঘটনাই একটি কেন্দ্রীয় সংযোগস্থল থেকে উঠে এসে গল্পে এক অনন্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এখানেও নীলাঞ্জন বাবু গল্পের গঠন ও শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার নবপ্রয়াস করেন এবং গল্পের পরিসমাপ্তি হৃদয়বিদারক হয়ে ওঠে।গল্পে যে মানবিক আবেদনের স্ফুরণ ঘটাতে দেখা যায় তা পাঠক মনে সমানুভূতি ও সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। গল্পের প্লট রচনা করা হয়েছে অপু নামক একটি শিশুর খুনের ঘটনার সাক্ষীকে কেন্দ্রকরে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মাধ্যমে। এই খুনটি তার নিজের বাবা সুমনের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে এবং সে খুন করেছে তার ব্যাভিচারিণী স্ত্রী অর্থাৎ অপুর মা মালাকে। সে-ই তার মাতৃহত্যার একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু হত্যার সময় অপুর বয়স যেহেতু পাঁচ বছর ছিল, তাই তার কোনো শাস্তি হয় না। কিন্তু ছয় বছর পর কারাবাস থেকে ফিরে শিশুটির পিতা সুমন তার সঙ্গে দুবার করে দেখা করতে আসে চাইল্ড হোমে। এখন অপুর বয়স এগারো বছর। ছেলেকে দেখতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এলেও পিতা ও পুত্রের বার্তালাপ খুব সামান্যই হয়, কখনও আবার হয়ও না। বাবাকে তার প্রায় অচেনাই বলে মনে হয়। তবু সে সুমনের একটি ছবি আঁকে এবং গল্পের একেবারে শেষে ছেলেটির তার বাবাকে চেনা মনে হয় বা দুর্নিবার এক টান অনুভব করে। গল্পটিকে চরম ক্লাইমেক্সে পৌঁছে দিয়ে লেখক আমাদের জানান সরকারি এক অফিসারকে ছুটে গিয়ে অপু বলে –

> "যদি কোনও দিন দেখা হয়, ওকে বলবে আমার খুব মন কেমন করে। ...ও যেন একবার আমাকে দেখতে আসে... অপুর দুগাল বেয়ে জলের রেখা।"[২৬]

কথকের এজাতীয় বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্যদিয়েই গল্প শেষ হয়। গল্পের নেপথ্যে বিচরণ করা অনুভবের অনুরণন কিন্তু থেকেই যায়। এই রেশ পাঠক মনে নিরন্তর প্রবাহিত থাকে বলেই তারা গল্পটিতে পায় সার্থক ছোটগল্পের অভাবনীয় আস্বাদন।

লেখকের 'কামনা পুকুর' গল্পটি ১৯৯৯ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে গল্পকার নীলাঞ্জন এক নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন, দাম্পত্য সমস্যা ও জটিলতাকে বর্ণনা করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা। স্ত্রী রচনা এমন একটি পুকুরে যেতে চায় যেখানে গেলে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ আছে বলে তার বিশ্বাস। এধরনের আস্থা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচায়ক এবং অবৈজ্ঞানিক যা রচনা তার অন্তরে অন্তরে পোষণ করে। স্বামী নিখিল কিন্তু যুক্তিবাদী মনোভাবের ধারক ও বাহক এবং একাধারে ধীর স্থির শান্ত। কিন্তু তার স্ত্রী হয়েও রচনা এমন একটি অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন যে, পুকুরটিতে স্নান করলেই বুঝি তার সব ইচ্ছা পূরণ হবে। নিখিল এরূপ অযৌক্তিক ব্যাপারকে বিশ্বাস না করলেও স্বামী হিসাবে একপ্রকার বাধ্য হয়েই স্ত্রীর মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এবং তার আবেগকে মর্যাদা দিতে গিয়ে সেই পুকুরের সন্নিকটে তাকে নিয়ে যায়। মাতৃত্ব লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা রচনাকে নিদারুণ কষ্ট দেয়। সন্তান না থাকায় নিখিলেরও দুঃখের সীমা নেই। তাই সে অযৌক্তিক ভাবনায় অবিশ্বাসী হলেও স্ত্রী-কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু দেখা যায়, গাইনোকোলোজিস্টের ডাক্তারি রিপোর্ট অনুযায়ী রচনার পক্ষে কোনোদিনও মা হওয়া সম্ভব নয়। এই গল্পে নীলাঞ্জনের ডাক্তারি বিদ্যার পরিসর ধরা পড়েছে। গল্পলেখক হিসাবে নীলাঞ্জনের সর্ব বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতার পরিচয় বহন করে ডাক্তারি বিদ্যাকে কাজে লাগানোর প্রবণতার মধ্যে। তবে গল্পটি শেষ হয়েছে কিছুটা নাটকীয়ভাবে। পুকুর দেখতে গিয়ে জনসমুদ্রের ঢলে স্বামী নিখিল তার স্ত্রী রচনাকে হারিয়ে ফেলে। তবে এর মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দানের প্রযত্ন রয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। লেখকের বর্ণনায় পাই, -

> "চোখের সামনে নিখিল যা দেখল, তা একটা বেশ বড় আর চওড়া পুকুরের অবয়ব। জলের চিহ্নমাত্র নেই বললে চলে। শুধু কাঁদা আর পাঁক। ... আর সেখানেই লুটোপুটি খাচ্ছে অজস্র মানুষ। ওই কাঁদার মধ্যেই, আত্মবিস্মৃত যেন, বারবার আছড়ে পড়ে মানুষগুলো ...। সেই ভিড়ে পুরুষ, নারী, শিশু সবাই। ... হঠাৎ নিখিলের মনে হয়, এত অসংখ্য মানুষের কামনার কী আগুনেই কী পুকুরের জল নিঃশেষিত?"[২৭]

অবশেষে এই ভিড়ের মধ্যে রচনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়ার এক অনিশ্চয় সম্ভাবনার মধ্যে গল্পটি শেষ হয়। অর্থাৎ রহস্যময়তা আলোচ্য গল্পের একটি বিশ্বস্ত ভাবনা। সেই সঙ্গে গল্পের শেষাংশে নিখিলের ভাবনার মাধ্যমে কার্যকরী হয়েছে মানুষের দুর্নিবার কামনার অমোঘ রূপটি। কামনা বা চাহিদার অনিবার্যতাও মানুষকে যে তলিয়ে নিয়ে যায়, জীবনবোধ থেকেই কখনও হারিয়ে যেতে হয় মানুষকে এই কামনার দ্বারা তাড়িত হলে,- এমন একটি দার্শনিক চেতনা প্রকাশের মাধ্যমে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'কামনাপুকুর' গল্পটি কু-সংস্কার ও চরিত্রের মনস্তত্ব রূপায়ণের দিক থেকে উল্লেখ্য। নিখিলের স্ত্রী রচনার কোনোদিন মা হতে না পারার অন্তহীন দুঃখ ও বিষণ্ণতার উপাদেয় ছবি এই গল্প।[২৮] - এহেন মন্তব্য গল্পটির জাত চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

নীলারঞ্জনের 'অসুখ' গল্পটি ২০০০ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমালোচকের ভাষায়, 'অসুখ' গল্পটিতে রয়েছে আত্মোপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ। বাবা-মার মিথ্যে বলার অভ্যাস কীভাবে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় - সেদিকটি গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।'[২৯] গল্পটির সূত্রপাত হয় একটি নাটকীয় ঘটনার অবতারণার মাধ্যমে। একটি বাচ্চা মেয়ে মিলি হঠাৎ করেই এক বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্স থেকে উধাও হয়ে যায়। তার পিতা মানব এবং মা নন্দিনী মেয়েকে খুঁজে পায় না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তার নিখোঁজ হওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানব তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। কিন্তু কোনো ফল হয় না। সকলের বিরক্তি যখন চরমে পৌঁছায় তখন অকস্মাৎ মেয়েটি নিজেই ফিরে আসে এবং অপহরণের এক রোমহর্ষক গল্প বলে। শিশুর মুখে বাণীবদ্ধ হওয়া এজাতীয় গল্প ফাঁদার বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। মেয়েটি বলে, কিছু অচেনা লোক তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। তারপর অপরাধীরা যখন বুঝতে পারে যে, তারা যে মেয়েটিকে অপহরণ করতে চেয়েছিল- মিলি সেই মেয়ে নয়, তখন তারা তাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়ে যায়। গল্পটির পরবর্তী অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। কেননা পরবর্তীতে মিলির মিথ্যে বলার অভ্যাস তার বাবা মানবের কাছে ধরা পড়ে যায়। অবশ্য তার এই বদ্ অভ্যাসের কথাটা মিলির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুরিমা বসু অনেক আগেই মানবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বাবা হিসাবে মানব খুব আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ করে, তার মেয়ের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাল্পনিক গল্প বলার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। সর্বোপরি পিতার চোখে এ-ও ধরা পড়ে যে, তার মেয়ে মিলি ওরফে উজ্জয়িনী রায় স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। মিথ্যের আশ্রয় তাকে অন্য একটি জগতের বাসিন্দা করে দিয়েছে। অথচ পিতা হয়ে মানব এটুকু বোঝে না যে, মেয়ের এহেন নৈতিক অধঃপতন ও মিথ্যাচারের কারণ তারাই। অভিভাবকের বাড়িতে সর্বক্ষণ মিথ্যার ওপর নির্ভর করে চলার ফলশ্রুতিই কন্যার এরূপ বিষময় উদ্গীরণ। উভয় পক্ষের মিথ্যাগুলো ক্রমে মিলির সঙ্গে তার মা-বাবার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। একসময়, মানবের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটতেও দেখা যায়। অবশেষে অবশ্য মানবের মধ্যে একটি প্রশ্ন চিহ্ন দানা বাঁধে, 'অসুখটা কি একা মিলির...?'[৩০] এখানে 'অসুখ' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অসুস্থতায় আক্রান্ত হলে যে মানুষ অধঃপতনের পাঁকে নিমজ্জিত হয়, আলোর সন্ধান তারা পায় না তেমনই জীবন চেতনার একটি পরম উপলব্ধিকে সত্যসন্ধানী লেখক তুলে ধরেছেন গল্পের অন্তিমে, -

> "যখন তখন আজকাল পাওয়ার কাট হচ্ছে। দেশলাইটাও খুঁজে পাচ্ছি না। এত অন্ধকার।"[৩১]

মিথ্যার আশ্রয়ে যে মানুষ একদিন অন্ধকারের অতলে ডুবে যায় তারই ব্যঞ্জনা দানের মাধ্যমে গল্পটির ইতি টানা হয়েছে - যা সুসার্থক ও উপভোগ্য বলা যায়।

নীলাঞ্জনের 'জেলখানার জানালা' গল্পটি ২০০৬ সালের 'বিভাব' পত্রিকায় প্রকাশিত এমন একটি অনবদ্য শিল্পপ্রয়াস যেখানে এক শিল্পীর মুক্তি ও কারাবাসের চমৎকার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি রাষ্ট্র বিরোধী লেখা লেখেন, চিত্র আঁকেন এবং নানা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ-কর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকেন। এই অপরাধেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আদালত যখন শিল্পীটিকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়, তখন তিনি বিচারকের কাছে কেবল তাঁর অঙ্কনের প্রয়োজনীয় রং তুলি, ইজেল ইত্যাদি সমাগ্রীর জন্য আবেদন করেন। কারণ তবে তিনি জেলে বসেও আঁকতে পারবেন, -

> "আর যদি ছবি আঁকতে পারি তাহলে আমার অবস্থান কোথায় সেটা আমার খেয়ালই থাকবে না। দেখতে দেখতে চোদ্দো বছর কোথা দিয়ে কেটে যাবে।"[৩২]

অর্থাৎ আঁকতে পারলে তবেই তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন। অবশেষে শিল্পী মানুষটি এমন আশ্চর্যসুন্দরভাবে জেল খানার দেওয়ালে একটা জানালার ছবি আঁকলেন যা দেখে মনে হল সেই জানালা দিয়ে বাইরের টাটকা উজ্জ্বল আলো জেল খানার ঘরে প্রবেশ করছে। এই ঘটনা জেলের বড়বাবু তথা জেলার সাহেবকে কুপিত করে তোলে। শিল্পীকে তিনি অভিযুক্ত করেন জেলখানায় উপদ্রব করার দায়ে। জেলের বড় বাবুর কাছে এই চিত্রিত জানালাটা কৃত্রিম বলে মনে হতেই পারে, কিন্তু শিল্পীর অনুভবে এটাই বাস্তব। কেননা শিল্পী তাঁর স্বাধীনতার খোঁজে, মুক্তির সন্ধানে এহেন চিত্র এঁকেছেন। তাইতো জেলারকে উদ্দেশ্য করে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন, -

> "জানলা এঁকেছি আমি ঠিকই। তবে এটা সত্যিকারের জানলা। ওটা খোলা জানলা বলেই বাইরে থেকে ঘরে এত আলো আসছে। - ওই আঁকা জানলাটাই আপনি সত্যি বলে ভাবতে পারবেন যদি আপনার কল্পনাশক্তি থাকে।"[৩৩]

এহেন বক্তব্য জেলারকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি বলেন, -

> "অর্ডিনারি কয়েদিদের নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু আপনাদের মতো এইসব ইনটেলেকচুয়্যাল, শিল্পী, সাহিত্যিক এদের নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা।"[৩৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি শিল্পীকে নির্দেশে দেন জানালাটাকে মুছে ফেলার জন্য। কারণ, জেলখানায় বাইরের আলো নিষিদ্ধ। আসলে এই আলো যে শিল্পীমনের উজ্জ্বলতার প্রতীক তা জেলার প্রথমত ধরতেই পারেননি। কিন্তু শিল্পীমানুষটি এই চিত্রটিকে সম্বল করে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, -

> "যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আমি।... মানে চোদ্দ বছর আমাকে এই ছোট্ট কুঠুরিতে কাটাতে হবে। একটা জানলা না হলে বাইরের দৃশ্য ওই জানলা দিয়ে দেখতে না পেলে আমার সময় কাটবে কী করে? আমি বাঁচব কীভাবে?"[৩৫]

প্রকৃতার্থে এই জানালা শিল্পীর বেঁচে থাকার রসদ। শিল্পীসত্তার আবেগজাত খোলামনের প্রসারিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। গল্পের অন্তিমে কিন্তু জেলার বাবুর ভাবান্তর ঘটে। তিনি অনুধাবন করতে পারেন, তাঁর জীবন জেলের বাইরে থেকেও নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ। অথচ শিল্পী মানুষটি জেলের ভেতরে থেকেও স্বাধীন। অর্থাৎ শিল্পী স্বাধীনতাকে কোনো অবস্থাতেই খর্ব করা যায় না। মানুষের ভেতরকার শিল্পীসত্তা জিনিসটি এমন একটি শক্তি বা ক্ষমতার অনুভব যাকে পৃথিবীর তৈরি কোনো জেলখানাতেই বন্দী করে রাখা সম্ভব নয়। একথা উপলব্ধি করে, -

> "জেলারের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। অনেকদিন বাদে নিজের পরাধীন জীবনের কথা ভেবে জেলার কাঁদছিলেন...।"[৩৬]

এখানেই গল্প শেষ। নীলাঞ্জন এখানে বাস্তবের দ্বৈততা ও বিভ্রম উভয়ের ছবি এঁকেছেন এবং সবার ওপরে শিল্প, শিল্পী ও শিল্পচেতনাকে স্থান দিয়ে শিল্প বোধের জয়গান ঘোষণা করেছেন। লেখকের মতো সরকারী উচ্চ পদস্থ অফিসারের এহেন সাহিত্যিক ফসলও যথার্থ শিল্পবোধের পরিচায়ক। তাই গল্পটিও হয়ে উঠেছে নবতর আস্বাদে পূর্ণ।

নীলাঞ্জনের 'গতানুগতিক প্রেমের গল্প' অথবা 'পিকাসোর ছবি' গল্পটি ইং ২০০৬ সালের 'বিভাব' পত্রিকার ফসল। এটি লেখকের একটি উত্তরাধুনিক মনস্কতার গল্প। এখানে তিনি কাহিনির গঠন ও বুনন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এটি কারাবাস এবং শেষপর্যন্ত তিলোত্তমা নামের একটি মেয়ের মুক্তির গল্প। এই মেয়েটি দু'জন ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধ ও রেষারেষির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা উভয়েই তাদের প্রিয়তমার ভালোবাসা অর্জন করতে তৎপর। গল্পমধ্যে বরফ সাহেব নামক এক অপরাধীর সমাজবিরোধী কাজকর্ম বিমর্ষ ছায়া ফেলে। সে একজন হিংস্র অপরাধী, অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে সে যৌথ লড়াই ও দ্বন্দ্বের আসর জমিয়ে তোলে যাতে তা মিডিয়ার নজরে পড়ে। তবেই তার প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হবে। টি.এস. এলিয়টের কবিতা ও পাবলো পিকাসোর ছবি দিয়ে এই গল্পে ইন্টার টেক্সচুয়েলিটিকে আনা হয়েছে। মূল কাহিনির পাশাপাশি অন্য একটি ছোট ঘটনাবৃত্তের বুননকৌশল গল্পটির আস্বাদ্যমানতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং গল্পটিকে ঐশ্বর্যদান করেছে। বলা উচিত, এক অসামান্য রূপকল্পের আবরণে বাংলা গল্পের আন্তর্জাতিক রূপায়ণ এই গল্পটি। এটি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গল্পগুলির সমতুল্য। লেখক এই গল্পটিকে বাখতিনের অভিধা অনুযায়ী 'পলিফনিক টেক্সট'-এ রূপান্তর করতে পেরেছেন। আর্ট যে জীবনকে স্বতন্ত্র এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, এই গল্প তারই সাক্ষ্য বহন করে। এই নিরিখে নীলাঞ্জন বাবুর গল্পের ধারণা নতুন এবং তাঁর গল্পে ন্যারেটিভের বাস্তবায়নও অনন্য। গল্পটি শেষ হয় এভাবে–

> "ক্রমাগত বিড়বিড় করছিল তিলোওমা। বলছিল বানর তুমি আমাকে সেই আনন্দ দাও যা একবার পেলে বৃক্ষ কোনও দিন ফসিল হয় না, আর নারী জরা এবং কুৎসিত বার্ধক্য থেকে অনেক অনেক দূরে থাকে।"[৩৭]

এহেন পরিসমাপ্তি গল্পটিকে অধিবাস্তব ও জাদু বাস্তবের আবহে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করে ।গল্পটি লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত অংশগ্রহণের দাবিও পূরণ করতে সক্ষম হয়। সার্বিকভাবে গল্পটি রসোত্তীর্ণ ও নীলাঞ্জনের গল্পসম্ভারের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি গল্প।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের আধারে একটি দিক স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের একজন সর্বভূক পাঠক। বহু পঠনপাঠনজনিত লেখনীর ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের ভাবনায় ও প্রকরণ শৈলীতে। নীলাঞ্জন বাবু তাঁর উৎকৃষ্ট গল্পসমূহের দ্বারা যেভাবে পাঠকসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছেন তা বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেরই এক পরম দৃষ্টান্ত। কাহিনির বৈচিত্র্য এবং প্রকাশভঙ্গির নতুনত্ব ছোটগল্পগুলিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় স্বকীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করে তুলেছে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সহজ সরল বিন্যাস, গতিশীল ও সাবলীল ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে মিশে নীলাঞ্জনের গল্পগুলিকে করে তুলেছে অনাস্বাদিতপূর্ব। তাঁর গল্পে তিনি এমন একটি জগৎ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন যা আমাদের এক অনির্দেশ্য আকর্ষণে কাছে টেনে নেয়। গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চরিত্রদের মূলত মধ্যবিত্ত পরিবারের আবহাওয়া থেকে তুলে এনেছেন এবং সেইসব চরিত্রের আচার আচরণ, কার্যকলাপ, মনস্তত্ব, জীবনযাত্রা, ভালোমন্দ ও দোষগুণকে নানাভাবে আলো ফেলে চুলচেরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সর্বোপরি, তিনি তাঁর গল্পে সফলভাবে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সুনিপুণ মিশ্রণ ঘটাতেও সক্ষম হয়েছেন। গল্পের সৌকর্য বৃদ্ধিতে তিনি যে অনন্যতা ও স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন তার মূলে কার্যকরী হয়েছে রূপক, উপমা, প্রতীক ও চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার। তাঁর ভাষা নাগরিক ও মার্জিত। সবমিলিয়ে তিনি একজন সফল আধুনিক ঘরানার গল্পকার। তার অবদানকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ একাবাক্যেই স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪, চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট
২০১১, প্রকাশক : প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১১৬৬
২. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০), প্রথম প্রকাশ- ১৮ই আগষ্ট ২০১০), ১লা ভাদ্র, ১৪১৭; প্রকাশক - ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯ /১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১২৩৭-১২৩৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, সেরা ৫০টি গল্প, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮, প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং-১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ (গন্ধ গল্প), পৃ. ২৩
৪. তদেব, (দু নম্বর আসামি গল্প) পৃ. ২৫
৫. তদেব, পৃ. ২৮
৬. তদেব, পৃ. ৩৩
৭. তদেব, পৃ. ৩২
৮. তদেব, পৃ. ৩৬
৯. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৮
১০. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, প্রাগুক্ত (সাহেবের দুঃখ গল্প), পৃ. ৪০
১১. তদেব, পৃ. ৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৪৭
১৩. তদেব, (ভার গল্প), পৃ. ৫২
১৪. তদেব, পৃ. ৫৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫৪-৫৭
১৬. তদেব, পৃ. ৫৮
১৭. তদেব, পৃ. ৫৮
১৮. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৯
১৯. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, প্রাগুক্ত (দূরের আকাশ গল্প), পৃ. ৬১
২০. তদেব, পৃ. ৬৬
২১. তদেব, পৃ. ৬৮
২২. তদেব, পৃ. ৬৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৩. তদেব, (দূষণ গল্প), পৃ. ৭৩
২৪. তদেব, পৃ. ৭৯
২৫. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৯
২৬. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, প্রাগুক্ত (টান গল্প) পৃ. ৯১
২৭. তদেব, (কামনা পুকুর গল্প), পৃ. ১০২
২৮. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৯
২৯. তদেব, পৃ. ১২৩৯
৩০. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, প্রাগুক্ত (অসুখ গল্প), পৃ. ১১৪
৩১. তদেব, পৃ. ১১৪
৩২. তদেব, (জেলখানার জানালা গল্প) পৃ. ২৪৭ - ২৪৮
৩৩. তদেব, পৃ. ২৫১
৩৪. তদেব, পৃ. ২৫১
৩৫. তদেব, পৃ. ২৫২
৩৬. তদেব, পৃ. ২৫৩
৩৭. তদেব, (গতানুগতিক প্রেমের গল্প অথবা পিকাসোর ছবি), পৃ. ২৬২